তারিখ: 19 DEC 2007 ... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

যুগান্তর

বিমল সরকার

এমন সনদ কার কী কাজে আসবে?

এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। একেবারেই অভাবনীয়। হতাশাব্যঞ্জক তো বটেই। ইংরেজ আমল, পাকিস্তান আমল, এমনকি স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে অন্তত প্রথম দুই-তিন দশকের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দেশে এমন পরিস্থিতি আর কখনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষবিমুখতার বিষয়টি সংক্রামক ব্যাধির মতোই যেভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে, সেদিকে এখনই সঠিকভাবে দৃষ্টি না দিলে পরিস্থিতিটি যে আরও ভয়াবহ রূপ নেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর জন্য দায়ী কে? এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা-সমালোচনা হতে পারে বিস্তর। কিন্তু কোনোভাবেই একে অস্বীকার করা যাবে না। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে যেমন তেমন, এর উপরের স্তরগুলোর হালহকিকত একেবারেই নাজুক।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, এমনকি অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও কথাটি সত্য যে, বছরের কোনোদিনই একটি ক্লাসেও উপস্থিত না থেকে কিংবা নামমাত্র দু'-চারদিন উপস্থিত থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্সের মতো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। অনিয়মিত নয়, ক্লাসে উপস্থিত না হওয়াদের নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবেই বছর বছর এ সুযোগটি করে দিয়ে চলেছে কর্তৃপক্ষ। আর অতি সহজেই সুযোগ পেতে পেতে শিক্ষার্থীদের মাঝে এরূপ ক্লাস না করার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতিটি যে কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা শিক্ষার সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নন তাদের সহজে বিশ্বাস করানো যাবে না।

ডিগ্রি পাস কোর্সের মেয়াদ এখন তিন বছর। সেমিস্টার পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয়বর্ষ ও তৃতীয়বর্ষে (চূড়ান্ত) পৃথকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করতে হয়। লক্ষ করার বিষয়, অধিভুক্ত কলেজগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শতকরা ৫০ ভাগ, ৪০ ভাগ, ২৫ ভাগ, এমনকি শাখা বা বিষয়বিশেষে ১০ ভাগ শিক্ষার্থীও ক্লাসে উপস্থিত থাকে না। কলেজে কলেজে এবং কলা, সামাজিকবিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা— সব শাখার ক্ষেত্রেই বলতে গেলে একই পরিস্থিতি। আর বিজ্ঞান শাখায় তো শিক্ষার্থী এমনিতেই কমছে দিন দিন। শহর ও মফস্বল এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুব একটা আলাদা করা যাবে না। এ নিয়ে সর্বত্র আলোচনা-সমালোচনা ও বিড়ম্বনার সীমা-পরিসীমা নেই। শিক্ষার্থীদের যে ক্ষুদ্র অংশটিকে শিক্ষকরা ক্লাসে পান তা কেবল প্রথম বর্ষেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা চূড়ান্ত বর্ষে নৈব নৈবচ। এদিক থেকে দর্শনই হোক আর ইতিহাসই হোক, ব্যবস্থাপনা আর হিসাববিজ্ঞান কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবকিছুই যেন একাকার। যার যার রুটিন অনুযায়ী হাজিরা খাতা ও চক-ডাস্টার হাতে ক্লাসে গিয়ে কোনো শিক্ষার্থীর সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসার বিড়ম্বনাময় অভিজ্ঞতা নেই এমন শিক্ষক খুঁজে পাওয়াটা খুবই দুষ্কর হবে। শিক্ষকদের এমন অভিজ্ঞতা একদিন-দু'দিনের নয়; লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি, 'দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ...।' এছাড়া একটি ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদি ১০০, ১৫০ কিংবা ২০০ থাকে, আর শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে পান মাত্র ১০, ১২ কিংবা ১৫ জনকে, তাহলে এটাকে কী বলা যাবে? শিক্ষকদের আরও একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বিড়ম্বনা হল, আজ যে শতকরা পাঁচ, আট বা দশ ভাগ শিক্ষার্থীকে তারা ক্লাসে পেলেন, আগামী ক্লাসে আর ওদের সবাইকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপস্থিতির হার হয়তো একই থাকবে, কিংবা একটু এদিক-সেদিক; কেবল নতুন ও পুরনো মুখের আংশিক অদলবদল। এ অবস্থায় বিষয়ভিত্তিক কোর্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়াতে যাওয়াও এক মহাবিড়ম্বনা।

> দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, এমনকি অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও কথাটি সত্য যে, বছরের কোনোদিনই একটি ক্লাসেও উপস্থিত না থেকে কিংবা নামমাত্র দু-চারদিন উপস্থিত থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্সের মতো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। অনিয়মিত নয়, ক্লাসে উপস্থিত না হওয়াদের নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবেই বছর বছর এ সুযোগটি করে দিয়ে চলেছে কর্তৃপক্ষ।

নতুন আর পুরনো মুখের অদলবদলে যে ক'জন শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত থাকে, তারা কি আসলে শিখতে আসে? আমার তা মনে হয় না। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য থাকে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে তথাকথিত একটি সাজেশন আদায় করা। সাজেশন আদায় হয়ে গেল তো ক্লাসে উপস্থিতির হার আরও কমে গেল। স্যারের দেয়া সাজেশন আর গাইড বই দেখে দেখে প্রশ্ন ও উত্তর মেলানো— এই করতে করতেই বছর পার। তবুও রক্ষা, নিয়ম অনুযায়ী এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে অন্য কলেজে বসে পরীক্ষা দিতে হয়। তা না করে আগের মতো নিজেদের কলেজেই বসে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকলে পরীক্ষার হলে এমনসব অসংখ্য পরীক্ষার্থীর দেখা পাওয়া যেত যাদের ক্লাসে তো দূরের কথা, শিক্ষকরা ক্যাম্পাসেই কখনও দেখেননি।

কেবল পাসকোর্স নয়, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের অবস্থাও বলতে গেলে একইরকম। শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিতি, চরম অমনোযোগিতা এবং গাইড বইয়ের তত্ত্ব-তালাশ। গাইড বই-ই শিক্ষার্থীদের ভরসা। যেন একমাত্র অবলম্বন। স্কুল শিক্ষার্থীদের মতোই ডিগ্রি পাস, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষার্থীদেরও হাতে হাতে বিভিন্ন কোম্পানির গাইড বই শোভা পাচ্ছে। গাইড বই কিনতে, হাতে রাখতে কিংবা হাতে নিয়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে কারও কোনো সংকোচ নেই। মূল বই কেনা ও পড়ার কোনো আগ্রহই নেই তাদের। কালেভদ্রে ক্লাসে ঢুকলে শিক্ষার্থীরা গাইড বইয়ের সঙ্গে শিক্ষকের দেয়া বক্তৃতা মিলিয়ে দেখে কোনটি অধিকতর বোধগম্য। গাইড বইয়ের বাইরে যে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বা লেখকের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ বই রয়েছে বা থাকতে পারে, এ সম্পর্কে বেশিরভাগেরই কোনো ধারণা নেই। এ ব্যাপারে শুধু শিক্ষার্থীদেরইবা দোষ দেই কীভাবে, মূল বই বাজারে পাওয়া গেলে তো সে কিনবে! কেবল জেলা সদর নয়, উপজেলা পর্যায়েরও অনেক কলেজে এখন ডিগ্রি পাস, অনার্স, এমনকি মাস্টার্স কোর্স পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এসব কোর্সের মোটামুটি উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের মূল বই কয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কিংবা আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। কদাচিৎ যদি কোনো কৌতূহলী শিক্ষার্থী 'যে কোনো লেখকের' একটিমাত্র মূল বই কিনতে আগ্রহী হয়, তাহলে খুঁজতে খুঁজতে সে একেবারে সারা!

আরেকটি কথা। মান-নির্বিশেষে বিষয়ভিত্তিক অসংখ্য গাইড বইয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে কেবল শিক্ষার্থী নয়, অনেক শিক্ষকও বলতে গেলে দিশেহারা। অনেকে আছেন এবং সংখ্যাটি নিতান্ত কম হবে না, যারা প্রধানত গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করে শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তর অতিক্রম করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা শিক্ষার্থীদেরও গাইড কিনে পড়তে উৎসাহিত করেন। গাইড বইয়ের দৌরাত্ম্য, শিক্ষার্থীদের অনীহা এবং লেখাপড়ার বাস্তব পরিস্থিতি— সবকিছু বিবেচনা করে স্বনামখ্যাত লেখক ও শিক্ষকরা মূল বই লেখার ব্যাপারে অনেকটা নিস্পৃহ হয়ে পড়েছেন।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষবিমুখতার কারণ অনুসন্ধান, এর বাস্তব চিত্র এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণের কাজটি সহজ নয়। আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে তো সম্ভব নয়ই। বিষয়টি নিয়ে বড় পরিসরে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা হতে পারে। কেবল আইনকানুন দিয়ে কিছুই হয় না, যদি এর যথাযথ প্রয়োগ না থাকে। পাকিস্তান আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কলেজিয়েট, নন-কলেজিয়েট ও ডিস-কলেজিয়েট শব্দগুলো খুবই শোনা যেত। নন-কলেজিয়েট ও ডিস-কলেজিয়েট হিসেবে অনেককেই মাশুল দিতে হয়েছে। এ ধরনের বিধান এখনও রয়েছে, তবে তা নামমাত্র; কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ।

স্বীকার করতেই হবে— বই, লেখাপড়া ও শ্রেণীকক্ষমুখিতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা আজকাল পরীক্ষায় অনেক ভালো ফলাফল করছে। অবশ্য এ নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনা। আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড বরাবরই চরম দুর্দশার কারণ। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ নেই, বই কেনা ও লেখাপড়া নেই। আছে কেবল সময় সময় ফরম পূরণ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। আর দামিদামি সনদ পাওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন কেউই কখনও এমনটি কল্পনাও করতে পারেন না। এমন সনদ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা জাতির কী কাজে আসবে? সবকিছুর আগে আড়ম্বর ও বাগাড়ম্বর বন্ধ করতে হবে।

বিমল সরকার : *সহকারী অধ্যাপক, বাজিতপুর কলেজ; কিশোরগঞ্জ*